আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা

সম্পাদক
পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য
অনিন্দ্যজ্যোতি মজুমদার

প্রথম খণ্ড

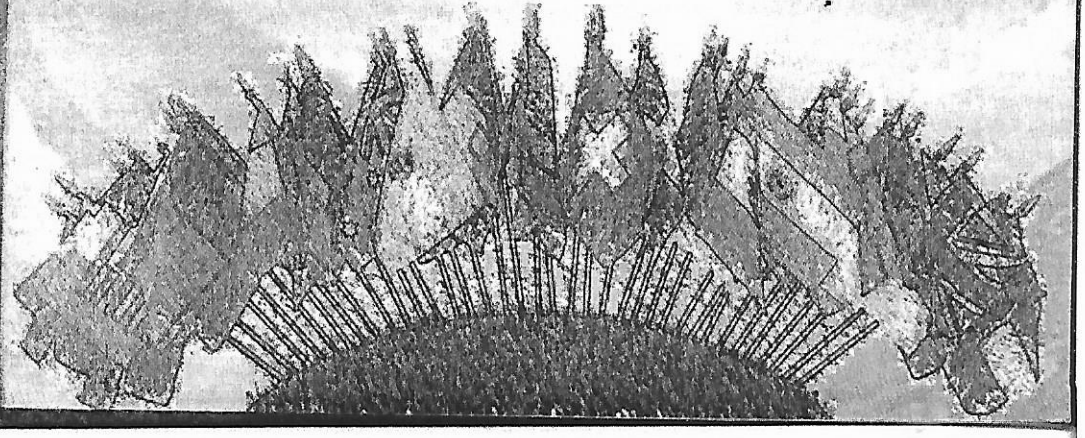

Antarjatik Somparker Ruparekha : Volume 1
Edited by : Purusottam Bhattacharya & Anindya Jyoti Majumdar,

1st Edition : January, 2022
Copyright © Purusottam Bhattacharya & Anindya Jyoti Majumdar,
ISBN : 978-81-953908-92
প্রচ্ছদ শিল্পী : দিলীপ ঘোষ

Published by Archana Das and Subrata Das
on behalf of Setu Prakashani
Address : 12/A. Shankar Ghosh Lane, Kolkata-6
Contact No : +91 33 2219 0704, +91 9433074548

বিক্রয়কেন্দ্র :
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
'বুকমার্ক', ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩
e-mail : setuprakashani@gmail.com
Website : www.setuprakashani.com

মূল্য দুই শত টাকা।

Lesser Seting
Dey Computer Center, 7/20 Gorapada sarkar lane, Kolkat-67

Printed by
Imprina 243/2B APC Road Kolkata-6

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের বিদেশ নীতি

শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক চক্রবর্ত্তী

মার্কিন বিদেশ নীতি

সমগ্র বিশ্বব্যাপী মার্কিন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাবের সূত্রে এ দেশের বিদেশনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কানাডা সহ ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রবর্গকে নিয়ে মোট ২৮টি দেশ কর্তৃক গঠিত বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক জোট NATO-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশটিই আবার NATO -র সনদ অনুযায়ী, সমস্ত সদস্য দেশের উপর বহির্সীমান্ত আক্রমণ প্রতিহত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তবে যেহেতু এই সনদে বর্ণিত সীমা উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যেই ভৌগোলিকভাবে সীমাবদ্ধ, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর্জেন্টিনা ও ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ফকল্যান্ড যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়নি। অন্যদিকে, NATO-র সদস্য নয় এমন অন্য চৌদ্দটি দেশও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতে NATO-র মুখ্য মিত্র হিসাবে পরিচিত। এদের প্রত্যেকেরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যা প্রতিফলিত হয়ে চলেছে বিবিধ সামরিক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক জোটের মধ্য দিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী দেশের মধ্যে রয়েছে —ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, এবং দক্ষিণ কোরিয়া। প্রসঙ্গত, যদিও তাইওয়ান সরকারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রকের সরকারিভাবে স্বীকৃত কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, তবুও অনেক বিশ্লেষক একে মার্কিন-মিত্র হিসেবেই দেখেন।

মার্কিন সরকারি আধিকারিকেরা মার্কিন বিদেশনীতির লক্ষ্যসমূহকে প্রায়শই যেভাবে চিহ্নিত করেন তা হল—

* দেশে এবং বিদেশে অবস্থানকৃত প্রত্যেক মার্কিন নাগরিকের সুরক্ষা ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।
* মার্কিন-মিত্র দেশগুলিকে বহির্সীমান্ত আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা এবং সেই অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সুরক্ষা বলয় নির্মাণ করা।
* সমগ্র বিশ্বে শান্তি, স্বাধীনতা (বিশেষত বাক্‌স্বাধীনতা ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা) ও গণতান্ত্রিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা।
* মুক্ত বাণিজ্য (কোনো রকম শুল্ক এবং যাতায়াত সংক্রান্ত বা অন্যান্য অর্থনৈতিক বাধার অনুপস্থিতিতে) ও পুঁজিবাদের প্রসারণের সূত্রে আর্থিক উন্নয়ন, উন্নতমানের জীবনযাত্রা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন পণ্যের বিক্রি ও চাহিদা বৃদ্ধি করা।
* অনগ্রসর দেশগুলিতে উন্নয়নমূলক এবং মানবিক সাহায্য প্রদান।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির উপর অন্যান্য দেশের সাথে বিভিন্ন চুক্তিগুলি আলোচনা করার ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। তিনি সামরিক বিভাগের বিভাগীয় প্রধানও বটে, যে সূত্রে সমরাঙ্গণে অবস্থিত সেনার উপর তাঁর আদেশের বিশেষ প্রভাব থাকে। মার্কিন 'সেক্রেটারি অফ্ স্টেট' -ই হলেন সে দেশের বিদেশ মন্ত্রী, যিনি আন্তর্রাষ্ট্র কূটনীতির মূল পরিচালক। যদিও কোনো যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা মার্কিন কংগ্রেসের-ই অধিকার, তবু রাষ্ট্রপতি কোনো বিশেষ অঞ্চলে কংগ্রেসের অনুমত্যনুসারে না গিয়েও সর্বাধিক ষাটদিনের জন্য সেনাদল মোতায়েন করতে পারেন। তবে এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সম্মতি সবসময়েই পাওয়া গেছে, কোনো নিকট-পরবর্তী সময়ে। মার্কিন সেনেট, যেটি মার্কিন কংগ্রেসের দুটির মধ্যে অন্যতম সভা, রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত বিদেশি চুক্তিগুলি অনুমোদন করবার বিশেষ অধিকার রাখে। একইভাবে, যে-সব আইন মার্কিন বিদেশ নীতির চরিত্র নির্ধারণ করে, তাদের অনুমোদনের পিছনে কংগ্রেসের দায়িত্বশীল ভূমিকাও রয়েছে। মার্কিন সরকারের তৃতীয় চরিত্রটি হল তার সুপ্রিম কোর্ট, যেটি ঐতিহাসিকভাবে বিদেশ নীতি প্রণয়নে বিশেষ বড় ভূমিকা পালন করেনি।

ঠান্ডা যুদ্ধ (১৯৪৭-৬২)

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্কের চাপা উত্তেজনা পুনরায় মাথাচাড়া দেয় যা পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে যথেষ্টই বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দকেই সাধারণত 'ঠান্ডা-যুদ্ধ'-এর প্রারম্ভিক সময়সীমা হিসাবে গণ্য করা হয়, যেটি অন্ততপক্ষে বার্লিন প্রাচীরের পতন (১১ নভেম্বর, ১৯৮৯)-এর আগে শেষ হয়নি।

এখানে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা দুটি ব্যপারে মনোনিবেশ করেন— একটি হল কমিউনিস্ট মতাদর্শের অজেয় ভাব, এবং অন্যটি হল সোভিয়েত রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক লক্ষ্যমাত্রাগুলি, বিশেষত পূর্ব ইউরোপের উপর কর্তৃত্ব (সারা বছর ব্যবহারযোগ্য সমুদ্র-বন্দরের অধিকার) এবং 'রক্ষণশীল' ও অন্যান্য 'স্লাভ' জনগণের সুরক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি। মতাদর্শভিত্তিক সংঘর্ষের প্রতিফলনটি লেনিনের ক্ষমতা দখলের (যেটি বলশেভিক বিপ্লব নামে পরিচিত; অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯১৭) মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, বস্তুত সে সময় থেকেই ঐতিহাসিকভাবে মার্কিন- সোভিয়েত বৈরিতার সূত্রপাত ঘটে। এ প্রশ্নে Walter La Feber 'জার' জমানার ভূমিকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যদিও ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ভেতর এক প্রকার 'দেতাঁত' (Detente) অবস্থিত ছিল, তবুও সেই সম্পর্ককে ঠিক বন্ধুত্বপূর্ণ কখনোই বলা যায় না। তবে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত-জার্মান শত্রুতা চরমে পৌঁছলে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট (Roosevelt) সোভিয়েত রাশিয়াকে সাহায্য করার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্তরে কথা দিয়েছিলেন (এর কারণ হল কোনো যুদ্ধকালীন মিত্রতাকে অনুমোদন করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসে ভোট গ্রহণই হয়নি)। বিশ্বযুদ্ধের খাতিরে এই সহযোগিতা আসলে কখনোই বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায় স্টালিন-এর কথা, যিনি মার্কিন সেনাদের সোভিয়েত